দ্বিতীয় সমাবর্তন ২০০১

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়
২ ফাল্গুন ১৪০৭

2ND CONVOCATION 2001

Khulna University
14 February 2001

সমাবর্তন
২০০১

SECOND CONVOCATION 2001

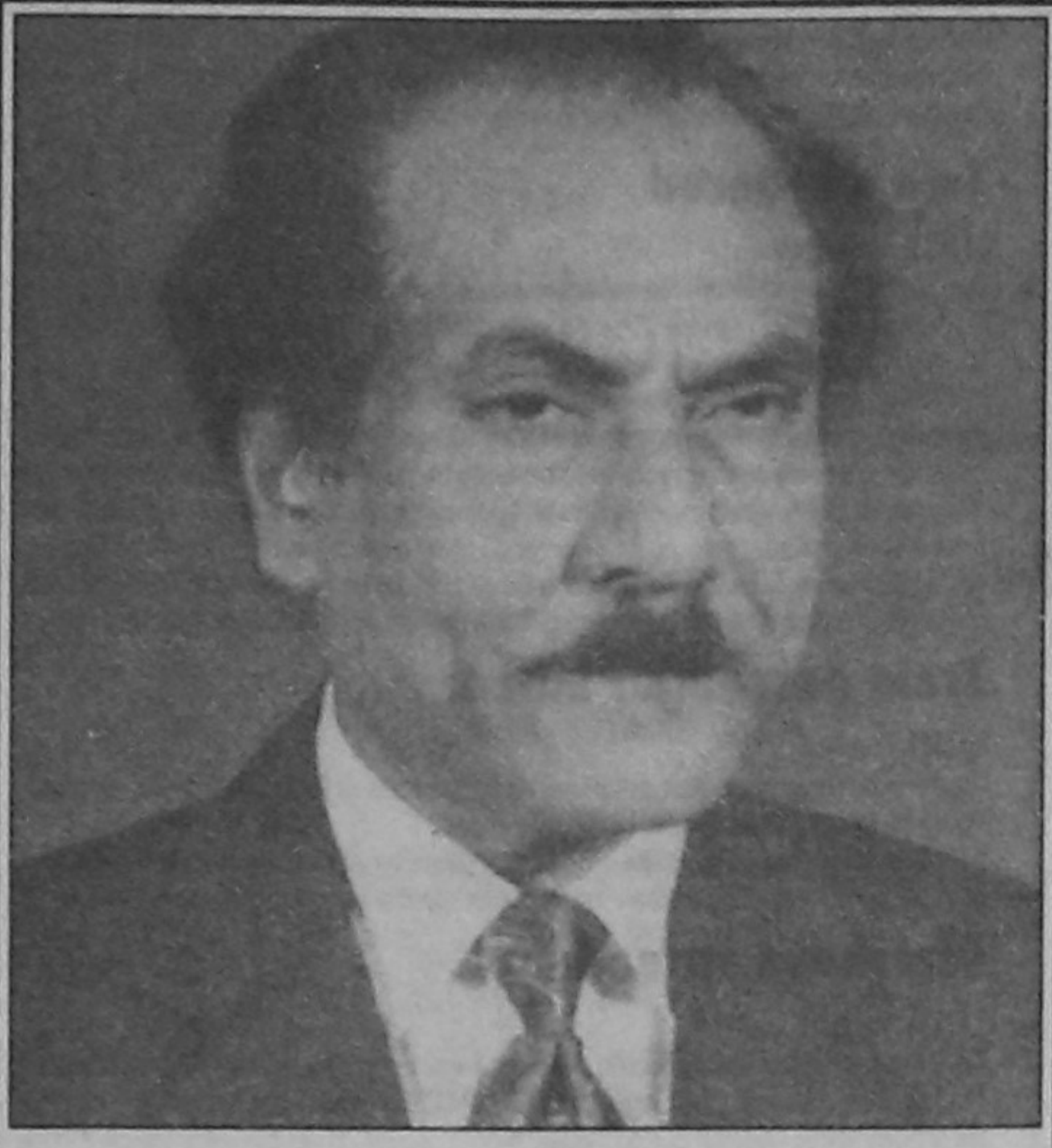

বাণী

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ স্মরণীয় দিনে আমি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকসহ সকল ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। এ দিনটি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকলের জন্য আনন্দের, সাফল্যের এবং গৌরবের।

আজকের বিশ্বে প্রয়োজন সুপরিকল্পিত উচ্চশিক্ষা, গবেষণা ও প্রযুক্তির উদ্ভাবন। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় দেশের ব্যতিক্রমধর্মী উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমের শুরুতেই গতানুগতিক শিক্ষার পরিবর্তন এনে সফলতার সাথে এক নতুন ধারার সৃষ্টি করেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর এবং যুগোপযোগী শিক্ষা চালু করে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সেই ভূমিকা পালন করতে পারে।

সমাবর্তনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাই। আমি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সমাবর্তনের সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ
রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

উন্নত জীবনের জন্য শিক্ষা

প্রফেসর ড. এস এম নজরুল ইসলাম, উপাচার্য, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

বিংশ শতাব্দী পেরিয়ে আজ একবিংশ শতাব্দীর শুরু। সভ্যতার শুরু থেকে সমাজের পরিবর্তন ও বিবর্তনের ধারা মানব চিন্তার অভিজ্ঞতার ফল। এর পূর্বে যা ঘটেছিল তা সময়ের প্রাপ্য হিসাবে গণ্য। গত পাঁচশ' বছর আগে ইউরোপিয়ান রেনেসাঁর প্রভাব এখানে উল্লেখযোগ্য, যা সুযোগ সৃষ্টি করেছিল চিন্তা, যুক্তি ও বিদ্যালোকের যুগায়নে। রেনেসাঁ বা কালচার রেভোলিউশন না হলে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভোলিউশন হতো না। কালচারাল রেভোলিউশন চিন্তার মুক্তি এনে দিয়েছিল অন্ধ বিশ্বাসের নিগড়ে। যা মানুষকে শিক্ষায় আলোকিত করেছিল। অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে মানুষকে জ্ঞানের আলোতে অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিল। মহামানবদের যাত্রার মিছিল বেগবান করেছিল। মিছিলের যাত্রা বহুপূর্বে থেকে যা ইউক্লিড, প্লেটো, এরিষ্টোটল, আর্কিমিডিসের যুগ পার হয়ে আরবে প্রবেশ করেছিল তা আবার ইউরোপে ফিরেছে। এ যেন শিক্ষা বা জ্ঞানের একটা রিলে রেস। যার হাতে ব্যাটন সেই অগ্রগামী। এ রেস থেকে যে ছিটকে পড়ে সে আর ফিরে আসে না। কিন্তু জয়ের অংশীদারিত্ব তার থেকেই যায়। আজকের মানব জাতি এ পৃথিবীকে যে ভাবে পেয়েছে তা বহু শ্রম, চিন্তা ও শিক্ষার অবদান সমৃদ্ধ। মন দিয়েছে দর্শন আর নির্দেশনা যা শিক্ষার মাধ্যমে রুপান্তর হয়েছে বুদ্ধিতে এবং বুদ্ধি দিয়েছে প্রযুক্তি। শিক্ষার মাধ্যমে বুদ্ধির মুক্তি না হলে প্রযুক্তি এগোত না। স্বাধীন চিন্তার মাধ্যমেই দর্শনের অবির্ভাব। স্বাধীন চিন্তা প্রকাশে আবার বাধা আছে। তাই চিন্তাকে বুদ্ধিতে রুপান্তর করতে শিক্ষার প্রয়োজন। বুদ্ধি প্রযুক্তি ও পরিবেশ সৃষ্টি করে। মানব সমাজের কাম্য বস্তু, শান্তি। সমাজে শান্তি সৃষ্টি হলেই মানুষ উন্নত জীবনের অধিকারী হয়। চিন্তা প্রাকৃতিক, যা বুদ্ধিতে রুপান্তর করতে শিক্ষার প্রয়োজন এবং সেই বুদ্ধিই প্রযুক্তির মাধ্যমে শান্তি বয়ে আনতে পারে।

মানুষ প্রথম শিক্ষা গ্রহন করে প্রকৃতির পাঠশালায়। প্রকৃতির প্রতিকূলতা ও নিষ্ঠুরতা মানুষকে শিক্ষা দিয়েছে কি করে বেঁচে থাকতে হয়। কি করে বিরুদ্ধ পরিবেশে জীবন নির্বাহ করতে হয়। প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার কারনে ডায়নোসরের মত অতিকায় প্রাণীও বিলুপ্ত হয়েছে। কিন্তু মানুষ তার নিরন্তর চেষ্টায় ও বুদ্ধির মাধ্যমে অজানাকে করেছে জয়। তারা দুর্গম পথকেও অতিক্রম করেছে অসীম সাহসিকতায়। সে তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য শিখেছে কিছু কৌশল। মানুষ যেদিন থেকে কৌশল রপ্ত শুরু করে সেদিন থেকে তার শিক্ষাও শুরু। মূলতঃ জীবন ও জীবিকার উপায়কে সহজ ও উন্নত করার লক্ষেই মানুষ অনাদিকাল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আসছে। সূচিত হচ্ছে শিক্ষার নব দিগন্ত। এভাবে মানুষের চিন্তার ও বুদ্ধির বিচিত্রতর অভিযাত্রার বাঁকে বাঁকে শিক্ষা উপহার দিয়েছে মানব সভ্যতা।

সমাজ বিজ্ঞানীরা মানব সভ্যতাকে তিনটি প্রধান স্তরে ভাগ করেছেন- ক) আদি স্তর খ) মধ্যস্তর গ) আধুনিক স্তর।

সমাজ গঠন ও মানব সভ্যতা বিকাশের মূলে রয়েছে শিক্ষা। প্রথম বাঁচার তাগিদেই শিক্ষা গ্রহণ করেছে মানুষ। জীবনযুদ্ধে নানা হাতিয়ারের ব্যবহার মানুষ শিখেছে। সভ্যতার আদি স্তরে মানুষ হিংস্র পশুর কবল থেকে বাঁচার জন্য পাথর নিক্ষেপ করেছে। ঝড়-ঝঞ্ঝা থেকে রক্ষা পাবার জন্য পাহাড়ের গুহায় অবস্থান করেছে; বনের ফলমূল, পশুর কাঁচা মাংস ভক্ষণ করে জীবন নির্বাহ করেছে। পশুর চামড়া পরিধান করে শীত নিবারণ করেছে। সভ্যতার মধ্যস্তরে এসে মানুষ বৈরী প্রকৃতির বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হয়েছে। কঠিন মাটিতে ফসল ফলিয়েছে দলবদ্ধভাবে পশু শিকার করেছে। পাথরে পাথরে ঘষে আগুন জ্বালাতে শিখেছে। ঘর বানাতে শিখেছে, অস্ত্র তৈরী করতে শিখেছে। মানুষ ব্যবহার করতে শুরু করেছে লৌহ ও তাম্র। মানুষের জীবন যাপন প্রণালীতে এসেছে গুণগত পরিবর্তন। ক্রমশ ঃ সহজ হয়েছে জীবন যাপন। এভাবেই শিক্ষার মাধ্যমে ঘটে আসছে পরিবর্তন ও বিবর্তন।

মানুষ যখন ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ ও মাথা গোঁজার আবাসন নির্মাণ করতে পারলো তখন সে ধীরে ধীরে আত্মবিকাশের নানা উপায় খুঁজতে শুরু করলো। তার চিন্তা চেতনাকে দীর্ঘস্থায়ী ও সর্বব্যাপী ছড়িয়ে দিতে চাইলো। কী ভাবে একের ভাবনা অন্যের ভিতর সঞ্চারিত করা যায় সে ভাবনা তাকে চঞ্চল করে তোলে। মানুষ তার লব্ধ শিক্ষা দ্বারা ভৌগলিক দূরত্ব ও কালের সীমাকে অতিক্রম করতে চাইলো। সে অঙ্গভঙ্গি করে, পর্বতগাত্রে এঁকে, মুখে অদ্ভুত শব্দ করে নিজের অভিব্যক্তি অন্যকে জানাতে শুরু করল। পরবর্তীকালে সেই আঁকা ছবি চিত্রকলায় রুপান্তরিত হলো, মানুষের মুখ নিসৃত অদ্ভুত শব্দরাজি একদিন সুশৃংখল বাক্যবিন্যাসে পরিণতি পেয়ে হলো - ভাষা। মানুষ আবিষ্কার করলো লিপি। সেই লিপি লেখা হলো পাহাড় গাত্রে পাথর খোদাই করে। তারপর গাছের পাতায় ও পশুর চামড়ায় লিখে শুরু হল মানুষের লব্ধ জ্ঞান ও শিক্ষাকে দীর্ঘস্থায়ী করার সাধনা। শত সহস্র বছরের সাধনায় মানুষ সার্থক হলো। একদিন কাগজ ও কলম তৈরী করল- মানুষ তার ভাবনাকে ছড়িয়ে দিল জগৎময়। এ পর্যন্ত মানুষ প্রকৃতির বিদ্যালয়ে যা শিখেছে, তার সবটাই তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এবং তার উন্নত জীবন অর্জনের লক্ষ্যে।

এরপর মানুষ আর পেছন ফিরে তাকায়নি। শিক্ষা থেকে বিশেষ শিক্ষায়, জ্ঞান থেকে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করে সে [illegible] দিল। স্বচ্ছ দৃষ্টি ও মন নিয়ে মানুষ জন্ম দিল এক নতুন সভ্যতার। যে পরিমণ্ডলে মানুষ প্রকৃতির যাবতীয় উপাদানকে করেছে পদানত। তারা বুঝেছে শিক্ষাই মানুষের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। শিক্ষাই মানুষের জীবনকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করেছে, দিয়েছে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা। এ প্রসংগে প্রখ্যাত প্রাবন্ধিক মোতাহার হোসেন চৌধুরী তার "শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব" নামক প্রবন্ধে মানুষের জীবনের দুটি সত্তার কথা উল্লেখ করেন, এর একটি জীবসত্ত্বা, অপরটি মানবসত্ত্বা বা মনুষ্যত্ব"।

এ দুটি সত্ত্বার মধ্যে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে শিক্ষা, যা উন্নত জীবনের পাথেয়। মানব জীবনের উন্নয়নে জৈবিক ও মানবিক সত্ত্বার গুরুত্ব অপরিসীম। মানব জীবনের উন্নয়ন ও মুক্তির জন্য দুটি উপায়ই অবলম্বন করতে হবে। একটি অন্ন বস্ত্রের চিন্তা থেকে মানুষকে মুক্তি দেবার চেষ্টা, আরেকটি শিক্ষা দীক্ষার দ্বারা মানুষকে মনুষ্যত্বের স্বাদ পাওয়ানোর সাধনা। এই দু প্রকার চেষ্টার ফলেই মানব জীবনের উন্নয়ন সম্ভব।

শিক্ষা মানুষকে মানব সত্ত্বার প্রকৃত পর্যায়ে উন্নীত করতে পারে। মানবিক মূল্যবোধের সাথে ব্যক্তির পরিপূর্ণ ও সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে। শিক্ষা '(Education)' শব্দটি দুটি ল্যাটিন শব্দ 'Educere' ও 'Educare' থেকে উৎপত্তি। এ দুটি শব্দ দিয়ে শিক্ষা বলতে যা বোঝায় তা হলো-নিজ সমাজে সার্থকভাবে বাস করার উপযোগী শক্তির মূল্যবোধ জাগ্রত করে ব্যক্তির দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রবণতা বিকশিত এবং আচরণ মার্জিত করার সামগ্রিক ক্রিয়াকলাপের নাম শিক্ষা। অথবা "ব্যক্তির দেহ ও মনের সকল ক্ষমতা বিকশিত, বিবর্তিত, মার্জিত করে তাকে বর্তমান ও ভবিষ্যতের উপযোগী সকল ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, নৈপুণ্য, অনুভূতি ও দৃষ্টিভংগির অধিকারী করে তোলার সহায়ক ব্যবস্থাদির নাম শিক্ষা। শিক্ষা মানুষের জীবনে সার্বিক উন্নয়ন সাধন করে ও মানব সমাজে শান্তি বয়ে আনে। মনোবিজ্ঞানী ওয়াইনী ওয়াইটেন বলেন- Learning is a relatively durable change in behaviour or Knowledge that is due expericnce.

অর্থাৎ শিক্ষা হলো আচরণ বা জ্ঞানের তুলনামূলক স্থায়ী পরিবর্তন যা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সংঘটিত হয়। চিন্তার স্বাধীনতা, বুদ্ধির স্বাধীনতা, আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা একমাত্র শিক্ষার দ্বারাই আনয়ন সম্ভব। একমাত্র শিক্ষাই আমাদেরকে মনুষ্যত্বের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। বলা যেতে পারে শিক্ষাই বুদ্ধির প্রখরতা ঘটিয়ে সমাজ কল্যাণে ভূমিকা রাখে। সমাজকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যায়। শিক্ষাচ্যুত জাতি পিছনে পড়ে থাকে। তাদের মানব জীবন বিকশিত হয় না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ইউরোপে যখন রুশো, ভলটেয়ার, সেক্সপিয়ার যুগান্তকারী সাহিত্য সৃষ্টি করছে ও জ্ঞানের প্রসার ঘটাচ্ছে তখন উত্তর আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ানরা কি করছে? অস্ট্রেলিয়ার মাউরী জনগোষ্ঠী কোথায় ছিল? একটি দিক থেকে দেখা যাবে তারা বিচ্ছিন্ন ছিল। তারা জীবন উন্নয়নের রেসে অনেক পশ্চাদপদ ছিল। সভ্যতার রিলে রেসের চাবিকাঠি তখন ইউরোপের হাতে, তারা সারা পৃথিবী সমৃদ্ধ করলো। নিজেরা ছড়িয়ে পড়েছিল আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকার বাসিন্দা হয়ে। তারপর মাত্র তিন'শ বছরের মধ্যে তারা চাঁদে পৌঁছে গেছে এবং অক্ষত ভাবে ফিরে এসেছে। এটাই সভ্যতা বিকাশের বা মানব জীবন উন্নয়নের একটি বিরাট ধাপ। তাই জীবন উন্নয়নে শিক্ষার বিকল্প নেই। তবে সে শিক্ষা হতে হবে নিজ পরিবেশে যুগোপযোগী।

শিক্ষার সংজ্ঞাতেই উন্নত জীবনের কথা বলা আছে। ইতিমধ্যে এদেশে শিক্ষা গুরু গৃহ ও টোল শিক্ষার স্তর পেরিয়ে উপনীত হয়েছে ঔপনিবেশিক আধুনিক শিক্ষার দোরগোড়ায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো ১৮০১ সালে শ্রীরামপুরমিশনে ভারত উপমহাদেশ বৃটিশ সিভিলিয়ানদের এ দেশীয় ভাষা শেখানোর মধ্যদিয়ে যে শিক্ষা চালু করা হয়; তাতে ব্যক্তির উন্নতির সাথে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের কোন সম্পর্ক ছিল না। জীবনবিমুখ এ শিক্ষা গ্রহণ করে এ দেশের মানুষ বৃটিশের কেরানী ও গোলামে পরিণনত হয়। এ শিক্ষা কতটুকু যুগোপযুগী তা আজ ভাবতে হবে। ঔপনিবেশিক শিক্ষা প্রসারের গতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ১৯১১ সালে এ দেশের জনসাধারনের মাত্র ৬ শতাংশ এবং ১৯৩১ সালে মাত্র ৮ শতাংশ সাক্ষর হতে পেরেছিল। ১৯৩৪-৩৫ সালের হিসেব মতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার সুযোগলাভকারী ছিলেন মোট জনসংখ্যার মাত্র ৪.৯ শতাংশ। ১৯৪১-৪২ সালে জনসংখ্যার ০.৫ শতাংশ মাত্র মাধ্যমিক উত্তর শিক্ষায় প্রবেশ করতেন।

দ্বি- জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭ এ ভারত ও পাকিস্থান নামে দুটি স্বাধীন দেশ আত্মপ্রকাশ করে যেখানে বৈষম্য ও ঔপনিবেশিক শিক্ষা অক্টোপাসের মত মানুষের কণ্ঠরোধ করেছিল। পরিসংখ্যানে দেখা যায় ১৯৬১ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে সাক্ষরতার হার ছিল মাত্র ১৬.৩ শতাংশ এবং ১৯৭০ সালে তা দাঁড়ায় ১৮ শতাংশ বৈষম্য নীতির ফলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে শিক্ষার কোন স্তরেই পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি হয়নি।

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর আমরা স্বাধীনতা অর্জন করি। ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকরী হয়। সংবিধানের ১৭ধারায় অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা বিষয়ে রাষ্ট্রের ভূমিকা স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়। এ সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে তৎকালীন সরকার অর্থাৎ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণ করেন।

১৯৭৪ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী বাংলাদেশের ৭ বছরের উপরে বয়সী জনসংখ্যায় সাক্ষরতার হার ছিল ২৪.৩ শতাংশ, ১৯৮১ সালে এ হার ছিল ২৬.২ শতাংশ। ১৯৭৪ থেকে ১৯৮১ সময়কালে বাংলাদেশের সাক্ষরতার প্রবৃদ্ধির হার মাত্র ২৩ শতাংশ। ১৯৯১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী সাক্ষরতা ২৪.৮২ শতাংশ জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারার চেয়ে এটি সাক্ষরতা হার বৃদ্ধির মন্থর গতির প্রমাণ।

বাংলাদেশ শিক্ষা, তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রদত্ত ১৯৮৮ সালের হিসেব অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণকারী বয়সীদের (৬-১০ বছর) মাত্র ৬২ শতাংশ প্রথম শেণীতে ভর্তি হয়। কিন্তু প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের দুই- তৃতীয়াংশ পঞ্চম শ্রেণী পাস করার আগেই drop out হয়ে যায়।

১৯৯০ সালে ইউনেস্কো প্রদত্ত পরিসংখ্যানে প্রকাশিত হয়ে যে, ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশ মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে অধ্যয়নকারী শিক্ষার্থীদের হার এ স্তরের শিক্ষায়অংশগ্রহণকারী উপযোগী বয়সের ১৮ শতাংশ। অথচ চীন, ভারত, নেপাল, মালয়েশিয়া, শ্রীলংকা, পাকিস্তান এবং থাইল্যান্ডে এ হার যথাক্রমে ৪৩%, ৩৯%, ২৬%, ৫৯%, ৬৬%, ১৯%, ২৮%।

ইউনেস্কোর মতে, "কোন উন্নয়নশীল দেশের মাধ্যমিক স্তরে পড়ার উপযোগী বয়সের ছেলেমেয়েদের অন্তঃত ৫০ শতাংশ শিক্ষার মাধ্যমিক স্তর উত্তীর্ণ হওয়া প্রয়োজন কেবলমাত্র সে দেশের চলতি উন্নয়ন প্রকল্পগুলো সচল রাখার উপযোগী দক্ষ জনশক্তির যোগানের গরজেই। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থানটি উপলব্ধি করা কঠিন নয়। এ পর্যন্ত আমরা এদেশের শিক্ষার প্রেক্ষাপট ও গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে একটি চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস নিয়েছি। কিন্তু এতে দেখা যায় প্রকৃত পক্ষে এ সময় জীবনমুখী নিজস্ব ঔপনিবেশিক ধারার কেরানী তৈরীর শিক্ষাই আমাদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছে। যার ফলশ্রুতিতে আজ ও এদেশের শিক্ষায় অব্যবস্থা বিদ্যমান।

আমরা জানি কেবলমাত্র জীবনমুখী ও মানসিক মূল্যবোধ সম্পন্ন শিক্ষার দ্বারাই জীবনের উন্নয়ন সম্ভব। শিক্ষা দীক্ষার ফলেই মানুষ সত্যিকার মানুষ্যত্বের স্বাদ পায়। মানুষের কাছে অন্নবস্ত্রের সমস্যার সমাধান হয়ে ওঠে সহজ। শিক্ষাকে অন্তরের মধ্যে ধারণ করতে পারলে মানুষের মধ্যে মূল্যবোধের সৃষ্টি হয়।

অন্তর মম বিকশিত কর অন্তরতম হে.........................

কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অন্তর্যামীর নিকট অন্তরকে বিকশিত করার আকুতি জানিয়েছেন। প্রার্থনা করেছেন তাঁর হৃদয়ে মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত করার জন্য। শিক্ষাকে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করতে পারলে মানুষের মধ্যে মূল্যবোধের উজ্জীবন ঘটে। মানব জীবনে মনুষ্যত্ব বিকাশে শিক্ষার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সে শেখায় কি করে জীবনকে উপভোগ করতে হয়। তার ফলশ্রুতিতে প্রতিদিনের হীনতা ও মালিন্যকে কাটিয়ে মানুষ তার মনুষ্যত্বের সন্ধান পায়। তাতেই মানুষের শান্তি ও আনন্দ, যা উন্নত জীবনের পাথেয়।

শিক্ষার আসল কাজ মানুষের মাঝে মূল্যবোধের সৃষ্টি করা। এই মূল্যবোধ মানুষের আত্মাকে মনুষ্যত্বের আস্বাদ দিতে পারে। শিক্ষাই পারে মানুষকে মানব সত্ত্বার উচ্চ শিখরে নিয়ে যেতে। কেননা-Education is the manifestation of perfection already in man. অর্থাৎ মানুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের প্রকাশই শিক্ষা। যা মানব কল্যাণে রাখতে পারে অশেষ ভূমিকা। পক্ষান্তরে মানব কল্যাণ বিহীন শিক্ষা অর্থহীন। শিক্ষার স্তরে স্তরে আজ অব্যবস্থা। পাশাপাশি আমাদের মানব সম্পদে রয়েছে অমিত সম্ভবনা। প্রকৃত শিক্ষার দীনতার কারনে আমরা সেই সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে পারছি না। আমরা শিক্ষার্থীদের শিক্ষার পাশাপাশি মানবিক মূল্যবোধের শিক্ষা দেই না। আত্মবিকাশের ও মননশীলতার শিক্ষা দিচ্ছি না। ফলে একটি সুষম শিক্ষার অভাবে আমাদের বর্তমান ও আগামী প্রজন্ম একটি যন্ত্রমানব হয়ে গড়ে ওঠছে। যা সমাজ কল্যাণের জন্য উপযোগী নয়। একপেশে শিক্ষা গ্রহণের ফলে একটি রুগ্ন ও পঙ্গুজাতি হিসেবে আমাদের সমাজ বেড়ে উঠছে। শিক্ষার সুফল উন্নত জীবন থেকে হচ্ছে মানুষ ক্রমাগত বঞ্চিত।

তাই রাস্তায় সন্ত্রাসী, খাদ্যে ভেজাল এবং অফিস-আদালতে ঘুষের প্রচলন রয়েছে। এ সব কর্মকাণ্ডে শিক্ষিত যন্ত্রমানবদের সম্পৃক্তির কথা অস্বীকার করা যাবে না। এরা বাংলাদেশের শিক্ষিতের হার ৬৫ শতাংশের মধ্যেই বিদ্যমান। বাকীদের কি হাল? তাই সমাজ জীবন/মানব জীবন উন্নয়নে যথার্থ শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। এজন্য শিক্ষার মাধ্যমে কারিগরী দক্ষতা বৃদ্ধির সাথে সাথে সামাজিক দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি বাঞ্ছনীয়। সমাজের মানুষের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ, পরস্পরের অধিকার স্বীকৃতি, শালিনতাবোধ এক গভীর সংকটে। মানবিক শিক্ষার মাধ্যমে অতি শৈশব থেকেই তাদেরকে মানসিক উন্নয়নের পথে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। যারা ১৮/২০ বছর অতিক্রম করেছে তারাতো এসব শিক্ষা পায়নি। তাদের নিয়ে আজ ভাবতে হবে। তাদের বিশাল অংশ (৩০-৪০%) বেকার। বেকার অবস্থায় শয়তানি বুদ্ধি তাদের মাথায় ভর করবে এতো স্বাভাবিক। এদের মধ্যে কেউ কেউ তথাকথিত শিক্ষিত পর্যায়ে পড়ে। অবশিষ্ট ক্ষেতের দিনমজুর অথবা শহরে এসে ভাসমান। অস্থিরতা ছাড়া এদের কাছ থেকে শৃঙ্খলা, শালীনতা ও সম্মানবোধ আশা করা যায় না। অন্যদিকে বস্তিতে বৃদ্ধি পেয়ে যারা বড় হয়ে উঠছে তারা কি ভাবছে? তারাতো প্রচন্ড হিংসা ও ক্রোধ নিয়ে বড় হচ্ছে। তারা সামান্য সাহায্য সহযোগিতা পেলেই ভাল হতে পারতো। কিন্তু সে সুযোগ তাকে কে দেবে? এদেরকে বাদ দিয়ে উন্নত জীবনের কথা ভাবা কাল্পনিক।

এ কথা সত্য যে, উন্নত জীবনের জন্যই শিক্ষা তবে সেই শিক্ষা ব্যবস্থায় মানবিক গুণাবলী সম্পৃক্ত করে আনতে হবে আমূল পরিবর্তন। শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে মাধ্যমিক ও উচ্চ স্তরে যুগোপযোগী ও বিজ্ঞান সম্মত শিক্ষা কারিকুলাম তৈরী অপরিহার্য। শিক্ষার সকল শাখায় মানবিক গুণাবলী শিক্ষার বিষয়টি বিশেষ বিবেচনায় রাখা দরকার। সাথে সাথে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল শাখায় বিশেষ করে প্রযুক্তিবিদ্যার উপর জোর দিতে হবে। কেননা এ মুহূর্তে প্রযুক্তির উৎকর্ষের উপরই নির্ভর করছে আমাদের দারিদ্র মুক্তির বিষয়টি।

উপসংহারে বলা যায়, সার্বিক উন্নত জীবনের জন্য উন্নয়ন তাৎপর্যপূর্ণ। মাথা পিছু আয় উন্নয়নের একমাত্র সূচক নয়। শিক্ষার হার, গড় আয়ু, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ইত্যাদিও বিবেচনায় আনতে হবে। তবে মাথাপিছু আয়বৃদ্ধি অন্যান্য সূচকের প্রবৃদ্ধির সহায়ক। বাইরের দান খয়রাতের মাধ্যমে আয়বৃদ্ধি হলে উন্নয়ন হবে না। তা অর্জন করতে হবে। হঠাৎ বাংলাদেশ বিশাল মাপের তেলের খনি পেয়ে গেল, তা বিক্রি করে বড়লোক হওয়া যাবে। কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানো যাবে না। এ [illegible] অনাকাংখিত ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে না। সুস্থ- সবল উন্নত ও সমৃদ্ধ হবে এদেশের সমাজ ও জাতি।

উপাচার্যের কথা

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার ধারাবাহিকতায় দ্বিতীয় সমাবর্তন এক উজ্জ্বল ঘটনা। অংশগ্রহণকারী গ্রাজুয়েটদের জন্য সমাবর্তন স্মরণীয়। এ অনুষ্ঠান শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী ও এতদঞ্চলের আপামর মানুষের জন্য এক গভীর প্রেরণা।

বহু আন্দোলন-সংগ্রামের ফসল এ বিশ্ববিদ্যালয়। তাই এর প্রতি গণমানুষের [illegible] প্রদানের মহান ব্রত পালন করে যাচ্ছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, জীববিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায় প্রশাসন স্কুলের পাশাপাশি সম্প্রতি কলা ও মানবিক, সমাজ বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিদ্যাসহ জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় উচ্চ শিক্ষা লাভের সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে। যার মধ্য দিয়ে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় আজ পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ পরিগ্রহ করেছে।

জীবনমূখী শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকবৃন্দ তাদের কর্মক্ষেত্রে ইতিমধ্যে সফলতার পরিচয় দিয়েছে। তাদের এ অর্জিত জ্ঞান দেশ ও জাতির ভাগ্য উন্নয়নের কাজে আসলে তখনই আমাদের মহৎ প্রয়াস সত্যিকার সাফল্য বয়ে আনবে। আজকের এই সমাবর্তনে ডিগ্রীগ্রহণকারী গ্রাজুয়েটদের প্রতি আমার সে আহ্বান রইল। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকমন্ডলী শিক্ষাদানের মহান ব্রত পালন করে আসছেন। আজ তাদের আনন্দ সবচেয়ে বেশি। তাদের গভীর অনুভূতির সাথে আমিও আপ্লুত। সার্বিক শিক্ষাকার্যক্রম বাস্তবায়নে কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ আন্তরিকভাবে কাজ করে চলেছেন। এ ক্ষেত্রে এতদাঞ্চলবাসীর একান্ত সহযোগিতার কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। সর্বোপরি এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রগতির [illegible]

প্রফেসর ড. এস এম নজরুল ইসলাম
উপাচার্য
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

বাণী

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। শিক্ষা কার্যক্রম সফল ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য আমি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং ছাত্র-ছাত্রীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক কালের অগ্রগতিতে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে। সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহার এবং আধুনিক, যুগোপযোগী ও আলোকিত মানব সম্পদ গঠনের মাধ্যমে দেশের দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে এ বিশ্ববিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আমি আশা করি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী অর্জনকারী ছাত্র-ছাত্রীরাই দেশের আগামী দিনের কর্ণধার। আশা করি তারা জ্ঞান ও প্রযুক্তির ধারণা কাজে লাগিয়ে দেশের অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখবে। সমাবর্তনকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে আমি তার সাথে সম্পৃক্ত হতে পেরে আনন্দিত।

আমি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা
প্রধান মন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে জেনে আমি আনন্দিত। কারণ, এ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশ বজায় রাখার এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। শিক্ষা কার্যক্রমের এ অব্যাহত সাফল্য সকলকে উৎসাহিত করেছে। দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ ধারা অক্ষুন্ন থাকবে বলে আমি প্রত্যাশা করি।

যুগের চাহিদা অনুযায়ী দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনে সরকার সচেষ্ট। ইতোমধ্যে যুগান্তকারী শিক্ষানীতি ঘোষণা করা হয়েছে। সাক্ষরতার হার বর্তমানে ৬৫ ভাগেরও বেশি অবস্থানে আনা সম্ভব হয়েছে।

একবিংশ শতাব্দীর নিরিখে দেশকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মাধ্যমে এগিয়ে নিতে হবে। সে লক্ষ্যে সরকার দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির ব্যাপক ও বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আজকের স্নাতকবৃন্দ আশা করি দক্ষতার সর্বোচ্চ স্তরে তাদের যোগ্যতার শ্রেষ্ঠত্বকে প্রদর্শন করতে পারবেন।

দ্বিতীয় সমাবর্তনের এই দিনে ডিগ্রী অর্জনকারী স্নাতকবৃন্দের সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সমাবর্তনের সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

এ এস এইচ কে সাদেক
শিক্ষামন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

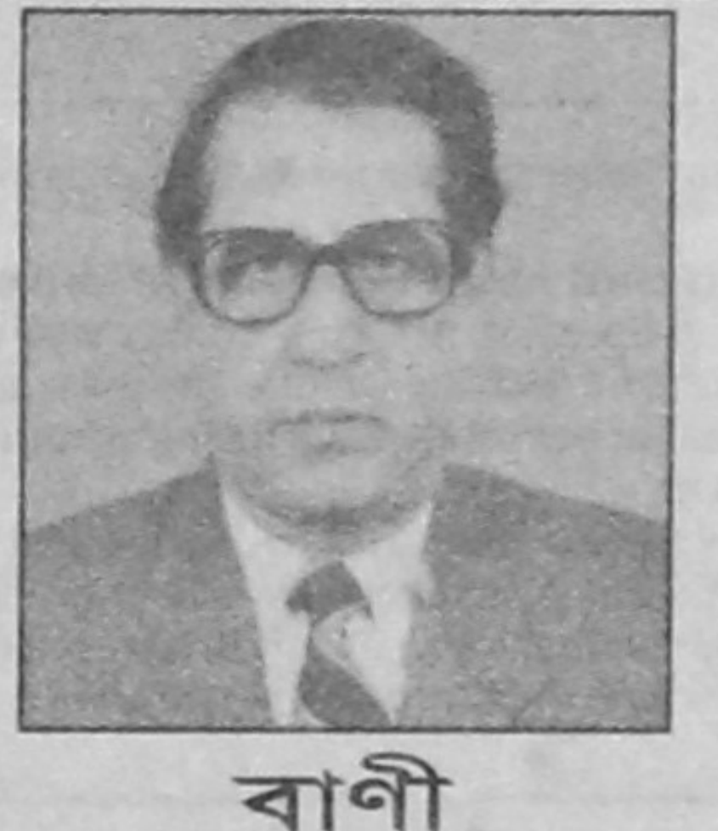

বাণী

দেশের একটি নবীন বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় স্বল্পতম সময়ের ব্যবধানে দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিয়মিত সমাবর্তন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ছাত্রদের মধ্যে লেখাপড়ার জন্য উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি করবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রকৃত জ্ঞান আহরণের পরিবেশ সৃষ্টি হবে- এটাই আমাদের প্রত্যাশা। কিন্তু বিভিন্ন কারণে দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হচ্ছেনা। নানা প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় দ্বিতীয় সমাবর্তনের আয়োজন করতে সক্ষম হয়েছে, এজন্য তারা প্রশংসার দাবীদার। আমি তাদেরকে জানাই উষ্ণ অভিনন্দন।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লগ্ন থেকে এর উন্নয়নে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করে আসছে এবং এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাফল্য অর্জনে মঞ্জুরী কমিশন অত্যন্ত আশাবাদী। এ কথা স্বীকার করতে কোন দ্বিধা নেই যে, প্রতিষ্ঠার পর থেকে সেশনজট ও সন্ত্রাসমুক্ত রেখে এ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ক্ষেত্রে একটি স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্টি করেছে এবং অর্থনীতির চাহিদানুযায়ী শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস একবিংশ শতাব্দীতে দেশ ও জাতির সেবায় এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করে তাদের যথার্থ অবদান রাখতে সক্ষম হবে। আমি তাদের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

সমাবর্তন আয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। সাফল্য কামনা করি অনুষ্ঠিতব্য দ্বিতীয় সমাবর্তনের।

প্রফেসর ডঃ এ টি এম জহুরুল হক
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

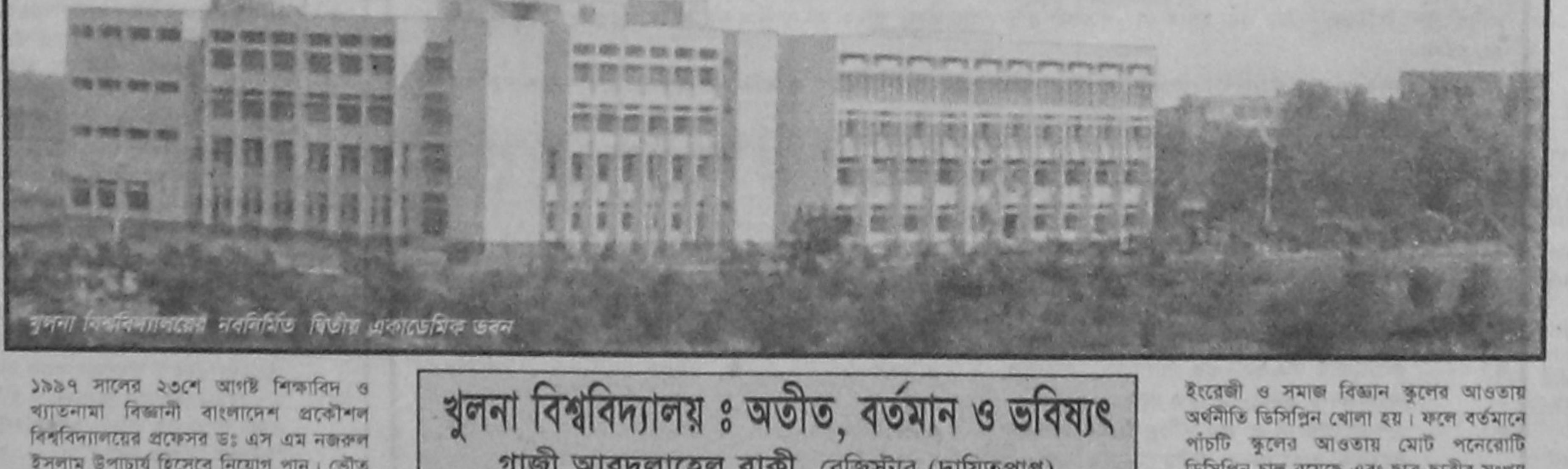

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনির্মিত দ্বিতীয় একাডেমিক ভবন

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ঃ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

গাজী আবদুল্লাহেল বাকী, রেজিস্ট্রার (দায়িত্বপ্রাপ্ত)

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় এক অনন্য উচ্চ শিক্ষার বিদ্যাপীঠ। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের মানুষের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশার তোরণ, উচ্চশিক্ষার ধারায় এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। তাই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক অফুরন্ত প্রাণশক্তি বিকাশের দ্বার উন্মোচন করেছে।

১৯৭২ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান সরকারের নির্দেশে গঠিত ডঃ কুদরাত-ই-খোদা শিক্ষা কমিশন-১৯৭৪ সালে খুলনা বিভাগে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করে। এই উচ্চারণের প্রেক্ষিতে এবং পরবর্তী সরকারের সিদ্ধান্তে ১৯৮৩ সাল থেকেই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জোর আন্দোলন শুরু হয়। ফলে ১৯৮৫ সালে গঠিত "জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী কমিটি" খুলনা অঞ্চলে প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও প্রশাসনিক রূপরেখা পেশ করে। ১৯৮৬ সালে "মাহাবুবুজ্জামান কমিটি" স্থান নির্বাচন রিপোর্ট দাখিল করে। এ প্রেক্ষিতে ১৯৮৭ সালের ৪ জানুয়ারী গল্লামারীতে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৮৯ সালে ৯ই মার্চ তৎকালিন মহামান্য রাষ্ট্রপতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। ১৯৯০ সালের জুন মাসে জাতীয় সংসদে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় বিল-১৯৯০ পাস হয়। ১৯৮৯ সালে বিশিষ্ট পরিকল্পনাবিদ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডঃ গোলাম রহমান, প্রকল্প পরিচালক/উপাচার্য হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। যার ঐকান্তিক চেষ্টায় যথাশীঘ্র শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের ভবিষ্যত পথ প্রশস্ত হয়। ১৯৯১ সালের ৩১শে মার্চ বিজ্ঞান, প্রকৌশল এবং প্রযুক্তিবিদ্যা স্কুলের আওতায় স্থাপত্য, কম্পিউটার বিজ্ঞান ও কৌশল, নগর ও গ্রামীণ পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায় প্রশাসন স্কুলের আওতায় ব্যবসায় প্রশাসন- এই চারটি ডিসিপ্লিন চালুর মাধ্যমে মোট ৮০ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। ফলে দেশের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে এক নব যাত্রার সূচনা হয়। ১৯৯১ সালের ২৫শে নভেম্বর সাবেক প্রধানমন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

১৯৯১-৯২ শিক্ষাবর্ষে জীব বিজ্ঞান স্কুলের আওতায় ফরেষ্ট্রি এন্ড উড টেকনোলজি এবং মেরিন বায়োলজি (বর্তমানে ফিশারিজ এন্ড মেরিন রিসোর্স টেকনোলজি) চালু করা হয়। বাংলাদেশ বেতার খুলনার পরিত্যক্ত একতলা ভবনটি দ্বিতলে রূপান্তর করা হয় এবং প্রশাসনিক ও একাডেমিক ভবন হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। ভবনের একটি কক্ষে ছয় হাজার পুস্তক নিয়ে গড়ে ওঠে বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী। পাশাপাশি একটি কম্পিউটার ল্যাবও স্থাপিত হয়। ইতোমধ্যে চারতলা বিশিষ্ট প্রথম একাডেমিক ভবনের নির্মাণ কাজ শেষ হয় এবং সেখানে ক্লাসসমূহ স্থানান্তর করা হয়। কয়েকটি ল্যাবরেটরীও স্থাপন করা হয়। এর মধ্যে জিয়োগ্রাফিক ইনফরমেশন সিষ্টেম ল্যাবরেটরী অন্যতম।

১৯৯৩ সালের ২৩শে আগষ্ট বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিজ্ঞানী প্রফেসর ডঃ মুহাম্মদ গোলাম আলী ফকির উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ পান। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজের গতি ত্বরান্বিত হতে থাকে। ইতোমধ্যে ৪১৬ জন ছাত্রের আবাসিক ব্যবস্থা সম্বলিত চারতলা বিশিষ্ট খানজাহান আলী হলের নির্মাণ কাজ শেষ হয়। জরুরী প্রয়োজন মেটানোর জন্য একটি সুদৃশ্য ক্যাফেটেরিয়া নির্মিত হয়। এছাড়া মেডিকেল সেন্টার, পোষ্ট অফিস, ব্যাংক শাখা, ই-মেইল এবং ক্যাম্পাসে কার্ড ফোনের ব্যবস্থা করা হয়। একাডেমিক ভবনের এক অংশে বিশেষভাবে নির্মিত লাইব্রেরীতে বৃদ্ধি করা হয় পুস্তকের সংখ্যা। যাতায়াতের জন্য বাস, মিনিবাস ও একটি জীপ ক্রয় করা হয় এবং সরকারী অনুদান হিসেবে একটা এ্যাম্বুলেন্স সংগৃহীত হয়। ১৯৯৫ সালে জীব বিজ্ঞান স্কুলের আওতায় বায়োটেকনোলজি, ১৯৯৬ সালে এগ্রোটেকনোলজি এবং ১৯৯৭ সালে এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স ডিসিপ্লিন চালু করা হয় এবং বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও প্রযুক্তিবিদ্যা স্কুলের আওতায় ইলেকট্রনিক্স এন্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিসিপ্লিন খোলা হয়। এ নিয়ে মোট স্কুলের সংখ্যা তিন-এ এবং ডিসিপ্লিনের সংখ্যা দাঁড়ায় এগারোতে। বেশ কিছু ল্যাবরেটরীও স্থাপিত হয়।

১৯৯৭ সালের ২৩শে আগষ্ট শিক্ষাবিদ ও খ্যাতনামা বিজ্ঞানী বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডঃ এস এম নজরুল ইসলাম উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ পান। ভৌত অবকাঠামো তৈরি ও সুষ্ঠুভাবে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার প্রতি তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেন। সেই অবধি নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কার্যক্রম দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। দ্বিতীয় একাডেমিক ভবনের নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে শেষ হয় এবং শতাধিক ছাত্রীর আবাসনের জন্য একটি ছাত্রী হলও নির্মিত হয়। এছাড়া উপাচার্য ভবন, ছাত্রদের জন্য "ছাত্র হল"ও সহযোগী অধ্যাপক ও সমপর্যায়ের কর্মকর্তাদের বাসগৃহ নির্মাণের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। নির্মিত হয়েছে একটি সুন্দর মসজিদ, একটি সুদৃশ্য শহীদ মিনার ও ফরেষ্ট নার্সারী। অচিরেই প্রশাসনিক ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু হবে। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ায় বিজ্ঞান প্রযুক্তির পাশাপাশি ১৯৯৯ সালে চারটি নতুন ডিসিপ্লিন চালু করা হয়। বিজ্ঞান প্রকৌশল ও প্রযুক্তিবিদ্যা স্কুলের আওতায় গণিত, জীব বিজ্ঞান স্কুলের আওতায় সয়েল সায়েন্স ডিসিপ্লিন, কলা ও মানবিক স্কুলের আওতায় ইংরেজী ও সমাজ বিজ্ঞান স্কুলের আওতায় অর্থনীতি ডিসিপ্লিন খোলা হয়। ফলে বর্তমানে পাঁচটি স্কুলের আওতায় মোট পনেরোটি ডিসিপ্লিন চালু রয়েছে এবং ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে দুই হাজার তিনশ'তে। এর মধ্যে চল্লিশ জন নেপালী ও ভারতীয়। লাইব্রেরীতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বই ও জার্নাল ক্রয় করা হয়েছে। বই এর সংখ্যা প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমে আধুনিক বিশ্বের শিক্ষাধারার সাথে সংগতি রাখার জন্য কোর্স ক্রেডিট সিষ্টেমের প্রবর্তন করা হয়। নতুন নতুন ল্যাবরেটরী স্থাপিত হয়েছে। ১৯৯৯ এর উল্লেখযোগ্য সংযোজন গবেষণা পত্রিকা Khulna University Studies এর প্রথম আত্মপ্রকাশ। কম্পিউটার ও ইংরেজী ভাষা শিক্ষার জন্য কোর্স চালু রয়েছে। আগামী শিক্ষাবর্ষে খুলনা আর্ট কলেজ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের "ইনস্টিটিউট অব ফাইন আর্টস" এ রূপান্তরিত হবে ও এর শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হবে। খুলনা মেডিকেল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভূক্ত হয়েছে।

বর্তমান উপাচার্যের নেতৃত্ব ও পরিকল্পনা খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত অন্যান্য সুবিধাদি দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। প্রতিটি ডিসিপ্লিনের শিক্ষা কার্যক্রমে ব্যবহারিক বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক কোর্স এর পাশাপশি ফরেষ্ট্রি এণ্ড উড টেকনলজি এবং ফিশারিজ এন্ড মেরিন রিসোর্স টেকনোলজি ডিসিপ্লিন দু'টিতে স্নাতকোত্তর কোর্স চালু করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজী। যুগের চাহিদার নিরিখে প্রত্যেক ডিসিপ্লিনের জন্য কম্পিউটার ও ইংরেজী কোর্সে অধ্যয়ন বাধ্যতামূলক। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম একটি সুনির্দিষ্ট একাডেমিক ক্যালেন্ডার এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে।

শিক্ষা ও গবেষণার মান উন্নয়নের জন্য উন্নত দেশের বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যৌথ শিক্ষা গবেষণা কর্মসূচী (Link program) সম্পাদিত হয়েছে। কানাডার ফ্লেমিং কলেজ, যুক্তরাজ্যের ওয়েলস বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যাংককস্থ এ আই টি-এর সাথে লিংক কর্মসূচীর আওতায় প্রশিক্ষণ ও ডিপ্লোমা গ্রহণ করে শিক্ষকরা যথেষ্ট লাভবান হন। প্রতি বছর বাস্তব জ্ঞানাহরণের জন্য ছাত্র-ছাত্রীরা সার্ক দেশসমূহে শিক্ষা সফর করে থাকে। খেলাধুলায় ছাত্র-ছাত্রীরা অগ্রণী ভূমিকা রেখে চলেছে। জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে উল্লেখযোগ্য সাফল্যসহ সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড যথা- কুইজ, ডিবেট ইত্যাদিতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীরা কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে চলেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষক বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে ব্যাপৃত রয়েছেন। গবেষণার ক্ষেত্রে শিক্ষকগণ যথেষ্ট অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। বেশ কিছু শিক্ষক বিজ্ঞান প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ ও অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণা প্রকল্প পরিচালনা করছেন। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন ডিসিপ্লিন কর্তৃক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার এবং ওয়ার্কসপ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রতি বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যালেন্ডার, ডায়েরী বিশ্ববিদ্যালয় মুখপাত্র "বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা" ও Prospectus প্রকাশিত হয়ে থাকে।

খুলনা বিশ্বদিদ্যালয়-কে একটি অত্যাধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বর্তমান উপাচার্য নিরলস ও আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। বর্তমানে প্রায় ১০০ একর জমির উপর ক্যাম্পাস অবস্থিত। এ বছর আরও জমি ক্রয় করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও ১০০ একর জমি অধিগ্রহণের প্রত্যাশা রয়েছে। আগামীতে বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও প্রযুক্তিবিদ্যা স্কুলের আওতায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং এবং সমাজ বিজ্ঞান স্কুলের আওতায় সোসিওলজি এন্ড এনথ্রোপলজি ডিসিপ্লিন খোলা হবে। বিভিন্ন ডিসিপ্লিনে এম এস কোর্স চালু করা হবে। লাইব্রেরী ভবন ও অডিটরিয়াম নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। খেলাধুলার জন্য স্পোর্টস কমপ্লেক্স স্থাপন করা হবে। ক্যাম্পাসে সামাজিক বনায়ন আরও বৃদ্ধি করা হবে। বিভিন্ন ধরণের ফিল্ড ল্যাবরেটরী, গ্রীন-হাউজ, হ্যাচারী, নার্সারী প্রদর্শনী পুকুর, লেক, খামার ইত্যাদি তৈরী করা হবে। মডার্ণ ল্যাংগুয়েজ সেন্টার ভাষাশিক্ষার কর্মসূচী চালু করবে।

ছাত্র-রাজনীতি, সন্ত্রাস ও সেশনজটহীন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অত্যন্ত সুন্দর শান্তিপূর্ণ পরিবেশে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ফলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোর্সসমূহ সম্পন্ন হচ্ছে। গত ১৯৯৭ সালে ১০ এপ্রিল প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে যুগোপযোগী ও প্রয়োগমুখী বিষয়সমূহে শিক্ষা প্রদান করা হয়। শিক্ষকবৃন্দ অত্যন্ত দক্ষ ও সুশিক্ষিত। কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ শিক্ষার সুষ্ঠ পরিবেশ বজায় রাখতে ঐকান্তিকভাবে সচেষ্ট। ছাত্র-ছাত্রীরা অত্যন্ত মেধাবী। ফলে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় দেশ ও বিদেশে এক আদর্শ ও ব্যতিক্রমধর্মী বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে পরিচিত।